দৈনিক সংবাদ 52

তারিখ 23 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে যা করণীয়

আবদুল খালেক

(শেষাংশ)

রেনেসাঁর যুগের মুক্তচিন্তা ও যুক্তি বিকাশের ধারায় সাধারণ মানুষের জীবন, দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি শিল্প-সাহিত্যে ও শিক্ষায় গুরুত্ব বহন করতে শুরু করে। এবং ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদিতে জ্ঞানার্জনে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাব্যবস্থাও মোটামুটিভাবে সেভাবে মোড় নেয়। ১৮৭০ সালের বৃটিশ শিক্ষা আইনে অভিন্ন পাঠক্রম ও সুদক্ষ শিক্ষক গড়ে তুলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দৃঢ়তার সাথে এই আইন প্রয়োগের ফলে কালক্রমে বৃটেন একটি সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল পাবলিক স্কুল। ব্যয়বহুল পাবলিক স্কুল মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে ছিল। ১৯৭০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বৃটিশ জেনারেলদের শতকরা ৯০ জন, বিচারকদের শতকরা ৮৫ জন, ফরেন সার্ভিসের শতকরা ৯০ জন এবং উচ্চপদস্থ সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৬৭ জন পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রায় দেশেই ব্যয়বহুল শিক্ষালয় রয়েছে যেখানে বিত্তবানরা উচ্চমানের শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও প্রাইভেট বিশ্ব-বিদ্যালয় ধনিক-বণিক ও বিত্তবানদের উন্নতমানের শিক্ষালয় বটে। বাংলাদেশের শিক্ষালয়ের সন্ত্রাস, সেশনজট, শিক্ষার নিম্নমান এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে বিত্তবানরা তাদের সন্তানদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার সার্বিক চেষ্টা চালাচ্ছে। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চমানের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশ্বের শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেদেশের শিক্ষার্থীকে এই ধারণা দেয়া হয় যে নিজের চেষ্টায় তাদেরকে সমাজের উচ্চস্তরে উঠতে হবে, তাদের দেশ পৃথিবীর সেরা দেশ এবং এক কথায় তাদের সবকিছুই সর্বগুণে শ্রেষ্ঠতম।

আমাদের শিক্ষার্থীরা রাশিয়ায় যেতে খুব আগ্রহী ছিল রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবাদে। এখন সেই আগ্রহ দেখা যায় না। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট সমাজ নির্মাণে কমিউনিষ্ট আদর্শভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদর্শবাদী শিক্ষকরা বিশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জন করেছে অন্যান্য দেশে অনুরূপ সফলতা অর্জনে লেগেছে প্রায় একশ' বছর। সেদেশে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা, কৃষক সবাই সার্বজনীন নিঃখরচা শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পেয়েছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে স্কুলবয়েসীদের মাত্র শতকরা বিশজন স্কুলে যেতো এবং অধিকাংশই সামান্য শিক্ষার পর স্কুল ছেড়ে দিতো। ১৯১৭ সালের আগে নয় থেকে পঞ্চাশ বছরের তাজিক, কিরগীজ ও তুর্কম্যানদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ২·৩, ৩·১ এবং ৭·৮। ১৯৩০ সালে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক আইন পাস করে আট বছরের উর্ধ্ব বয়সী সকল ছেলেমেয়েকে চার বছরের জন্যে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিশের দশকের শেষের দিকে সাত বছরের এবং ১৯৫৯ সালে আট বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পাস করা হয়। ১৯৭০ সালের শুমারিতে দেখা গিয়েছে সমগ্র রাশিয়ায় শতকরা ৯৯·৪ জন পুরুষ এবং ৯৯·৭ জন মহিলা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। এবং আট বছরের শিক্ষাপ্রাপ্তদের শতকরা ৮০ জন দশ বছরের স্কুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক প্রাণহানি এবং ১৯১৭ সাল থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক অবরোধ থাকা সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ দশকে বিশ্বের তৃতীয় জনবহুল দেশে এত শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞের উত্থান সম্ভব হয়েছে শিক্ষাকে সেদেশের জীবনে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির দৃঢ় কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে। রাশিয়ার গতিবেগে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে অর্জিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাশিয়ার চমকপ্রদ সফলতা অর্জনে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিলঃ (ক) সবার জন্যে নিঃখরচা শিক্ষা, (খ) মেধাবী সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, (গ) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতির ওপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন, (ঘ) শিক্ষায় অভিন্ন ধারা গ্রহণ, (ঙ) প্রাইমারি স্তরে আঞ্চলিক মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং (চ) শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে কোন প্রকার শিথিলতার অনুপস্থিতি।

আজকের ইউরোপ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত অগ্রসর, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন বৃটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তখন সেদেশের শ্রমিকরা ছিল অশিক্ষিত, উচ্ছৃংখল ও ধ্বংসাত্মক কর্মে দ্বিধাবোধহীন। ১৮০৭ সালেও তাদেরকে লেখাপড়া শেখাবার প্রস্তাব রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নাকচ করে দেয় এই বলে যে, শিক্ষিত হয়ে শ্রমিকরা মিল-মালিককে বেকায়দায় ফেলবে অধিকারের দাবিতে। মেক্সিকোতে অবস্থানরত স্পেনিশ মিশনারীরা এককালে স্বদেশে খবর পাঠালো যে উপজাতীয়দের শিক্ষালাভের সুযোগ দিলে তারা বিপ্লবী হয়ে উঠবে। ১৮৫০ সালে মাদ্রিদে একটি নতুন স্কুল স্থাপনের আবেদন নাকচ করে শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে, ''আমাদের আর চিন্তাশীল মানুষের দরকার নেই, আমরা চাই কাজের বলদ''। কালের প্রবাহে ইউরোপের চিন্তা-চেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে যার ফলে বৃটেন ১৮৭০ সালে সার্বজনীন শিক্ষা আইন পাস করে এবং প্রায় একই সময় স্পেনসহ অন্যান্য দেশও বৃটেনের অনুসরণ করে। একমাত্র জার্মানী-তেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষানীতি চালু ছিল। প্রুশিয়ার সম্রাট ফরমান জারি করেছিলেন যে, পাঁচ থেকে তেরো বছরের সবাইকে দিনে ছয় ঘন্টা স্কুলে লেখাপড়া করতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালে যারা সারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের শতকরা ৪ জন মারা গিয়েছে পাঁচ বছরে পৌঁছার আগে, বাদবাকি ৯৬ জন স্কুলে গিয়েছে ও প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করেছে ৯৩ জন এবং সেকেন্ডারি স্কুলের প্রথম স্তরে গিয়েছে ৮১ জন।

দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে বলা যায় যে, নিদেনপক্ষে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট শাসন আমলের বাধ্যতামূলক প্রাইমারি শিক্ষার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আমরা পরিচিত। অন্তর্বর্তীকালে দেখেছি শক্তিধর সরকার ও জাঁদরেল শিক্ষামন্ত্রী। দেখেছি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কয়েকটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, শতশত সেমিনার ওয়ার্কশপ এবং আরো কত কি। কিন্তু আজও আমাদের শিক্ষার হার শতকরা বিশের কোঠায় আটকা পড়ে আছে। অবশ্যি সামগ্রিকভাবে শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, কারিগরি শিক্ষিত এবং বিজ্ঞান ও পেশায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু জাতীয় শিক্ষিতের শতকরা হার তেমন বাড়েনি জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে। সাম্প্রতিককালে আমাদের চেতনার মোড় ফিরেছে এবং সবাই সোচ্চার হয়ে বলতে শুরু করেছি যে, বিশাল জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত জনসম্পদে পরিণত করা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকবে না। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকার সার্বজনীন প্রাইমারি শিক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। বর্তমানে প্রাইমারি শিক্ষা প্রদানের জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত সেগুলো হলো : (ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩৭,৭৪০), (খ) রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮,৮৩০), রেজিস্ট্রেশনের জন্যে অপেক্ষমাণ বিদ্যালয় (৪,৬৮৮), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা (২,৫৮৩), (ঙ) কিন্ডার গার্টেন (২,৫০০), (চ) ইবতেদায়ী মাদ্রাসা (১৬,০২৮), (ছ) উচ্চতর মাদ্রাসায় ইবতেদায়ী শাখা (৬,০৮৬) ও (জ) মসজিদ, টোল ও অন্যান্য (২৩৯)।

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্জিত শিক্ষার মানে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। মসজিদ, টোল ইত্যাদিতে বেতন পরিস্থিতি দান-খয়রাতি গোছের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা পদ্ধতিতে নেই কোন সামঞ্জস্য। একমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সামগ্রিক-ভাবে দেখতে গেলে, এই জটিল পরিস্থিতিতে অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন কিভাবে সম্ভব হবে তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে প্রাথমিক শিক্ষার মানে অন্ততপক্ষে চলনসই সমতার কথাও ভাবা যায় না। লক্ষণীয়, বাংলাদেশে প্রাইমারি শিক্ষায় একাধিক ধারা প্রচলিত এবং এই ধারায় সেকেন্ডারি ও উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষাও পরিচালিত। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে এই যে এক বৈশিষ্ট্য তার প্রভাব সমাজজীবনেও পরিলক্ষিত। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, যেসব মাদ্রাসায় উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী ও মাষ্টারস্ পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সেসব মাদ্রাসায় প্রাইমারি শিক্ষারও সংযোজন। এই পরিস্থিতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইমারি ফ্যাকাল্টির অস্তিত্বের সমতুল্য বলেই মনে হয়। প্রাইমারি বয়েসীদের জন্যে এই শিক্ষা পরিবেশ শিক্ষাশাস্ত্রে নীতিসম্মত ও বিধেয় বলে মনে হয় না।

এতদসত্ত্বেও প্রাইমারি শিক্ষা সম্প্রসারণে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এই লক্ষ্যে যা করণীয় তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো বিবেচিত হতে পারে।

(১) পাঠক্রমের গুরুভার হ্রাসকল্পে একমাত্র বাংলার প্রচলন এবং ধর্মীয় শিক্ষার মৌখিকীকরণ।

(২) ৮,৮৩০ টি রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাইমারি বিদ্যালয় এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্যে অপেক্ষমাণ ৪,৬৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারীকরণ।

(৩) প্রাইমারি শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত সবক'টি প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পাঠক্রম প্রবর্তনঃ মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, মসজিদ ও টোলকে তদতিরিক্ত পাঠক্রম প্রবর্তনের অনুমতিদান।

(৪) প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগে উচ্চতর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রবর্তন।

(৫) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকের ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ।

(৬) ডবল শিফটে শিক্ষালয় চালুকরণ এবং ডবল শিফটে সম্মত শিক্ষককে মূল বেতনের অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ বেতন দান। প্রয়োজনবোধে ডবল শিফট পরিচালনায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ।

(৭) গ্রামে ও শহরে স্কুল-ভিত্তিক স্থায়ীভাবে শিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন স্কেল এমনিভাবে সাজানো যেন সম্ভাব্য প্রমোশনের সুযোগ-সুবিধা বেতন স্কেলেই প্রতিফলিত হয়। এর ফলে শিক্ষকরা এক জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে নিজ নিজ সংসার দেখাশোনা করে শিক্ষকতায় অধিকতর নিষ্ঠাবান হতে সক্ষম হবেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের নিজ নিজ গ্রাম/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড-কে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) থানাভিত্তিক প্রাইমারি শিক্ষা বোর্ড গঠন। স্থানীয় সাংসদ হবেন বোর্ডের উপদেষ্টা। বোর্ডে অন্যদের মধ্যে থাকবেন মহিলা সদস্য ও থানায় নিয়োজিত ডাক্তার। বোর্ডের অধীন থাকবেন স্কুল পরিদর্শক।

(৯) প্রাইমারি বয়েসী সবাইকে স্কুলে নেয়া ও শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে প্রাইমারি শিক্ষা কমিটি গঠন। ভূমিহীন, ভিটাহীন ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্যে সরকার যে খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিতরণের দায়িত্বে থাকবে এই শিক্ষা কমিটি। তদারকি করবেন গ্রামের ক্ষেত্রে প্রাইমারি শিক্ষক ও যথাসম্ভব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিশনার।

(১০) প্রাইমারি স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করে গঠন। স্থানীয় হাইস্কুলের একজন শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও শিক্ষাদরদী ব্যক্তি ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের নিয়ে গঠিত হবে এই কমিটি। মনোনয়ন দিবে থানা শিক্ষা বোর্ড।

(১১) এনজিও এবং জনকল্যাণমূলক স্থানীয় সংস্থাসমূহকে প্রাইমারি শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সংযোজন এবং তাদের মধ্য থেকে প্রাইমারি শিক্ষা কমিটিতে সদস্য মনোনয়ন।

(১২) প্রচার মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে প্রতিনিয়ত প্রচার চালাতে হবে যে শিক্ষাই জীবনকে অর্থবহ করে, সুন্দর করে, উন্নত করে ও শিক্ষা বয়ে আনে ব্যক্তির মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা এবং সৃষ্টি করে আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি।

পরিশেষে বলতে চাই যে, আমাদের শিক্ষানীতি, শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য, শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতির গোঁজামিল নিরসনে সরকারকে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে হবে।